মহিরুহ

(*সাম্রাজ্যের সিংহাসন*-এর দ্বিতীয় পর্ব)

ইমরান রাইহান

সঞ্চালন
প্র কা শ নী

বই:	মহিরুহ
লেখক:	ইমরান রাইহান
বানান ও ভাষারীতি:	মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান
প্রচ্ছদ:	আবুল ফাতাহ
পৃষ্ঠাসজ্জা:	নন্দন

মহিরুহ

ইমরান রাইহান

সঙ্কলন
প্র কা শ নী

মহিরুহ

ইমরান রাইহান

প্রথম প্রকাশ
মার্চ ২০২৩

গ্রন্থস্বত্ব
© প্রকাশক

অনলাইন পরিবেশক
সুইপকার্ট ও ওয়াফিলাইফ

মূল্য: ৪০০ টাকা (চারশত টাকা মাত্র)

সন্দীপন
প্র কা শ নী
বাংলাবাজার, ঢাকা

অর্পণ

দিলশাদ মাহমুদ মাহদি,

যে আমার বই পড়লে ভয়ে থাকি, কখন কোন ভুল ধরে বসে।

লেখকের কথা

বছরখানেক আগে সঞ্চালন প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয় ''ঘোড়ার খুরে পদানত করলো যারা সাম্রাজ্যের সিংহাসন'' বইটি। ইতিহাসের বিখ্যাত কজন বীরের জীবনী তুলে ধরাই ছিল উদ্দেশ্য। কিন্তু বিখ্যাতদের খ্যাতির আড়ালে অনেক সময় চাপা পড়ে অখ্যাতদের কর্মও। প্রতিটি বিজয় ও সাফল্যের পেছনে লুকিয়ে থাকে হাজারো মানুষের কর্ম, ত্যাগ ও অবদান। প্রচলিত ইতিহাসে যাদের আলোচনা আসে খুব কমই। এমন কিছু বীরের জীবনীই তুলে ধরা হয়েছে ''মহিরুহ'' বইটিতে।

গত ৫ বছর ধরে বিভিন্ন সময় লিখেছি এই লেখাগুলো, তবে আগে কখনো প্রকাশিত হয়নি। সম্প্রতি সালেহ রেজা ভাই লেখাগুলোর কথা জানতে পেরে আদেশ করলেন সবগুলো লেখা একত্র করে জমা দিতে। লেখাগুলো পুনরায় নিরীক্ষণ করে জমা দেই। এখন তা আপনাদের সামনে মলাটবদ্ধ। সাম্রাজ্যের সিংহাসন বইয়ের মতো এই বইতেও তথ্যসূত্র উল্লেখ করা হয়নি, তবে প্রতিটি তথ্য নেওয়া হয়েছে মূল উৎসগ্রন্থ থেকেই।

যদি বইটি পাঠকের ভালো লাগে তাহলেই আমাদের পরিশ্রম স্বার্থক হবে।

ইমরান রাইহান।

মিরপুর, ঢাকা।

ভূমিকা

একটি বিশাল সাম্রাজ স্থাপন করতে বা টিকিয়ে রাখতে হলে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হলো—একজন বিচক্ষণ ও সাহসী সেনাপতি। যে একাই একটি অসম যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। যার কাছে সৈন্য সংখ্যা বা যুদ্ধাস্ত্রের আধিক্যতা কখনো মুখ্য নয়; বরং জীবনের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে লড়ে যাওয়াই যার প্রধান প্রতিপাদ্য। ইতিহাসের পাতায় তাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে রচিত হয়েছে তাদের অসীম আত্মত্যাগ ও অবিস্মরণীয় সব কীর্তির কারণে।

ইতিহাসে রণাঙ্গনের মহাবীর বা সফল সেনাপতি হিসেবে আমরা জানি—নেপোলিয়ন, জুলিয়াস সিজার, চেঙ্গিস খান ও আলেকজান্ডারের নাম। যাদের প্রায় সবারই হাতে মুসলমানদের রক্ত প্রবাহিত হয়েছিল অথবা রাজ্য জয় ও যুদ্ধের নামে গণহত্যায় তারা ছিল কুখ্যাত। অথচ তাদেরকেই সাহসিকতা ও বীরত্বের মাপকাঠি মনে করি। কিংবদন্তিদের কাতারে স্থান পায় কেবল তারাই।

পক্ষান্তরে আমরা মুসলিম মহাবীরদের নাম উচ্চারণে খালিদ বিন ওয়ালিদ, সালাউদ্দিন আইয়ুবী পর্যন্ত বলেই থেমে যাই। জানি না জীবন উৎসর্গকারী লড়াকু যোদ্ধা বারা ইবনে মালেক, যিরার ইবনে আজওয়ার, জুনাইদ ইবনে আব্দুর রহমান ও বারকে খানের মতো মুসলিম মুজাহিদদের নাম ও তাদের অসামান্য কীর্তিগুলোকে। যাদের ভয়ে কুফুরি শক্তির সকল রাজা-মহারাজা পর্যন্ত ব্যতিব্যস্ত থাকত। কাঁপত তাদের পুরো সাম্রাজ্য। যাদের তেজোদীপ্ত বক্তব্যে ক্লান্ত-শ্রান্ত যোদ্ধারাও অকাতরে জীবন বিলাতে তৈরি হয়ে যেত। হকের কালিমাকে সারাবিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে নিজেদের জীবন যারা

কুরবান করে দিয়েছিল আল্লাহর রাস্তায়। তারাই আমাদের আকাবির, তারাই আমাদের মহিরুহ।

তেমনি সব কীর্তিমান মুসলিম মুজাহিদগণের অজানা সব দুর্ধর্ষ অভিযান ও রণাঙ্গনের সাহসী ঘটনা অবলম্বনেই রচিত ''মহিরুহ''। আশা করি উক্ত বইটি পাঠে ইতিহাসপ্রেমী পাঠকদের নিকট এক অজানা ইতিহাসের বদ্ধ দুয়ার উন্মোচন করবে।

বইটির রচিয়তা আমাদের সকলের প্রিয় ও তরুণ আলেমে দ্বীন ইমরান রাইহান হাফিজাহুল্লাহ। বাংলাদেশে ইসলামি ইতিহাসবেত্তা হিসেবে পাঠক মহলে যিনি বেশ জনপ্রিয়। ইতিহাস বিষয়ে গবেষণা বা পড়াশোনায় তিনি এক অনন্য নজির স্থাপন করেছেন। কল্পিত গল্প ও উপন্যাসে বুঁদ হয়ে থাকা পাঠকদের ইসলামি ইতিহাসের পাঠক হিসেবে গড়ে তুলেছেন নিজের লেখনীর চমৎকার বর্ণনাশৈলীর মাধ্যমে। ইতিহাসের অখ্যাত ও অজানা বিষয়গুলো গল্প ও উপস্থাপনা শৈলীর মজবুত গাঁথুনিতে তাঁর লেখায় চমৎকারভাবে ফুটে উঠে, যা অত্যন্ত সুখপাঠ্য। আলোচ্য গ্রন্থেও তিনি মুসলিম ইতিহাসের অজানা সব কিংবদন্তিদের সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়েছেন। ইতিহাসের গ্রহণযোগ্য গ্রন্থসমূহ থেকে চয়নকৃত ঘটনাসমূহই তাঁর লেখায় তুলে এনেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর এই মেহনতকে দ্বীনের জন্য কবুল করুন।

মুসলিম উম্মাহের মাঝে ইসলামি ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সুস্থ চর্চার যে প্রচেষ্টা সঞ্চালন প্রকাশনী করে যাচ্ছে—তারই ধারাবাহিকতায় আশা করা যায়, এই বইটিও পাঠক মহলে বেশ সাড়া ফেলবে। আল্লাহ তাআলা উক্ত প্রকাশনীর কাজগুলোকে কবুল করুন। আমিন।

মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান

শুক্রবার, ১০ই শাবান, ১৪৪৪ হিজরি

হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ

সূচিপত্র

বারা ইবনে মালেক	১১
কাকা ইবনে আমর	১৮
জুনাইদ ইবনে আব্দুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ	২৬
আব্দুল কাদের জাজাইরি রাহিমাহুল্লাহ	৩৬
মুহাম্মদ আল কামিল রাহিমাহুল্লাহ	৪২
হুসামুদ্দিন বারকে খান রাহিমাহুল্লাহ	৪৮
যিরার ইবনে আজওয়ার রাযিয়াল্লাহু আনহু	৫৪
মাসলামা ইবনে আব্দুল মালিক	৬২
বারকে খান	৬৭
সামাহ ইবনে মালিক আল খাওলানি রাহিমাহুল্লাহ	৭৩
উকবা ইবনুল হাজ্জাজ আসসুলালি রাহিমাহুল্লাহ	৭৮
গিয়াসউদ্দিন কায়খসরু রাহিমাহুল্লাহ	৮৩
আবু বকর বিন উমর লামতুনি রাহিমাহুল্লাহ	৮৯
ইজজুদ্দিন কাসসাম রাহিমাহুল্লাহ	৯৩
মানসুর আশুরমা রাহিমাহুল্লাহ	৯৮
উসমান বিন ফুদি রাহিমাহুল্লাহ	১০৩
মুসা ইবনে আবি গাসসান রাহিমাহুল্লাহ	১০৮
মাওলানা আজম তারিক শহিদ রাহিমাহুল্লাহ	১১৩
জিয়াউর রহমান ফারুকি শহিদ রাহিমাহুল্লাহ	১১৯
হক নেওয়াজ জংভি রাহিমাহুল্লাহ	১২৮
ফকির মির্জা আলি খান	১৩৯
পাঠকের পাতা	১৪২

বারা ইবনে মালেক

নবিজি নেই, কী বিরাট শূন্যতা জগৎ জুড়ে, আবার কেউ কেউ হঠাৎ করেই মুরতাদ হয়ে যাচ্ছে। কেউবা মূল ইসলাম থেকে সরে গিয়ে নিজের সুবিধামতো ইসলাম রচনা করছে। এর মাঝে নতুন ফিতনা হয়ে আসে নিজেকে নবি দাবি করা ভণ্ড কিছু লোক। আল্লাহর সুস্পষ্ট ঘোষণার পরেও কিছু মানুষ তাদের দাবি, চাকচিক্য দেখে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। খলিফা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মনে শান্তি নেই। একে তো তাঁর প্রিয় বন্ধুর ওফাতে তিনি ব্যথিত, অপরদিকে বহুমুখী ফিতনা সামলাতে সামলাতে বিপর্যস্ত প্রায়। মানুষ পথহারা হয়ে যাচ্ছে, ধর্ম ত্যাগ করছে, ফরজ বিধান অস্বীকার করছে। নবুওয়াতের মিথ্যা দাবি নিয়ে ফায়দা লুটছে কিছু ভণ্ড-প্রতারকের দল। সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম সবগুলো ফিতনার মুখোমুখি হয়ে আল্লাহর দ্বীনের হেফাজতে জান বিলিয়ে দিচ্ছিলেন। আর এই ফিতনাগুলোর মাঝে সবচেয়ে কঠিন ফিতনা ছিল মুসাইলামাতুল কাজ্জাবের ফিতনা। সে কেবল নিজেকে নবি দাবি করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং কুরআনকে নকল করে তার বানোয়াট কিছু উক্তিকে আসমানি কিতাব হিসাবে প্রকাশ করে। পাশাপাশি সে নিজের বানোয়াট ধর্মে আজান ও নামাজের আয়োজন শুরু করেছিল। তার মিষ্টি ভাষা, নকল আল্লাহভীরুতা, চাকচিক্য, জৌলুসে প্রতারিত হয়ে বহু সহজ-সরল মানুষ তার নবুওয়াত স্বীকার করে। বনু হানিফার সকলেই তাকে নবি হিসেবে মেনে নেয় ও তার দেখানো পথে ইবাদাত শুরু করে। তার অনুসারীর সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছিল। যারা তাকে নবি বলে স্বীকার করেছিল। তাদের সিংহভাগ জানত যে, সে একজন মিথ্যুক, ভণ্ড ও প্রতারক। তথাপি তারা গোত্রপ্রীতি ও অহংকারের বশবর্তী হয়ে তাকে

সমর্থন করছিল। স্বভাবতই আরবদের মাঝে গোত্রপ্রীতির প্রথা ছিল। বিশেষ করে নিজের গোত্রকে সেরা প্রমাণ করার কোনো সুযোগই কেউ হাতছাড়া করত না। তাই বিভিন্ন গোত্র, বিশেষ করে আরবের রবিআ গোত্র মুসাইলামার নবুওয়াতের দাবিতে বেশ গর্ববোধ করে। তাদের মনোভাব ছিল হোক না ভণ্ড; নবি তো। এবার নিশ্চয় কুরাইশিদের থেকে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হবে। *মুসাইলামার ভণ্ডামির ব্যাপারে তার ভক্ত ও অনুসারীরা যে অবগত ছিল, তার একটি বড় প্রমাণ হলো, একবার তার ভক্তকে প্রশ্ন করা হয়, তুমি কি সত্যিই মুসাইলামাকে নবি হিসেবে বিশ্বাস করো? ভক্ত উত্তর দেয়, কখনো না। আমি জানি মুহাম্মদ আল্লাহর সত্য নবি আর মুসাইলামা মিথ্যুক। তথাপি আমার কাছে মদিনার আসল নবি হতে ইয়ামামার ভণ্ড নবি অধিক পছন্দনীয়।*

মুসাইলামার প্রচার-প্রসার ঘটার পিছনে আরেকটা বড় কারণ ছিল, তারই মতো মিথ্যা নবুওয়াতের দাবিদার এক ভণ্ড নারী সাজাহ-এর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা ও বিয়ে। সমগ্র আরব বিজয় করে ভোগ করার স্বপ্ন নিয়ে তারা একে অপরকে বিয়ে করে এবং তাদের অনুসারীরা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। পাশাপাশি মুসাইলামা তার ধর্মকে সহজ থেকে সহজতর করতে থাকে। তার অনুসারীদের জন্য ফজর ও এশার নামাজকে সে মাফ ঘোষণা করে। ফলে তার দল শুধু ভারিই হয়নি, বরং সহজ ধর্ম পালনের লোভে দলে দলে তার হাতে বাইয়াত হতে থাকলো সাধারণ লোকজন। একইসঙ্গে মুসলিমদের গ্রেফতার করে নানাবিধ অত্যাচার করা শুরু করল তার অনুসারীরা। কার্যতই এটা নব্য খলিফা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য অনেক বড় এক পরীক্ষা ছিল। শিরক হতে মুক্ত থাকার জন্য যে নবির হাত ধরেছেন, একের পর এক নির্যাতন সহ্য করেও যে নবির পাশে থেকেছেন, সেই নবির সব দাবিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে মুসাইলামা এক নিমিষেই। এটা কী করে মেনে নিতে পারেন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু? তিনি সুগঠিত বাহিনী পাঠালেন ভণ্ড নবিদের মোকাবেলার উদ্দেশ্যে। নবুওয়াতের দাবিদার অন্য প্রতারক তুলাইহার নিধনে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি; যতটা কঠিন হয়েছিল মুসাইলামার বাহিনীকে পরাস্ত করা। সম্পূর্ণ ভুল, প্রতারণা ও ভণ্ডামির ওপর আছে জেনেও মুসাইলামার অনুসারীরা কেবল গোত্রপ্রীতি ও অহমিকার বশে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যে দুর্বার, কঠিন প্রতিরোধ গড়ে তোলে তা ভাষায় প্রকাশ অসম্ভব। বনু হানিফ গোত্রের চল্লিশ

হাজার সেনা মুসলিম সেনাদের নির্বিচারে আঘাত করতে থাকে। একে একে শহিদ হতে থাকেন উম্মাহর অগ্রগামী, আল্লাহর দয়া, ক্ষমাপ্রাপ্ত সাহাবায়ে কেরাম। মুসাইলামার সৈন্যরা প্রবল আক্রোশে লড়াই করতে থাকে। অবস্থার অবনতি দেখে সাইফুল্লাহিল মাসলুল খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসলিম সেনাদের একত্রিত করে সুসংহত করেন এবং তীব্র আঘাত হানেন মুসাইলামার বাহিনীর ওপর। মুসলিমদের অপ্রতিরোধ্য আক্রমণ দেখে হকচকিয়ে যায় শত্রুসেনারা। তারা ময়দান থেকে পালিয়ে হাদিকাতুর রহমান নামক এক বাগানে আশ্রয় নেয়। বাগানটি উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল বলে আল্লাহর শত্রুরা মোটামুটি একটি নিরাপত্তাস্থল পেয়ে যায়। তারা মুসলিম বাহিনী আসার আগেই বাগানের ফটক বন্ধ করে ওত পেতে বসে। মুসলিম সেনারা বাগানটি অবরোধ করে সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকে।

একে তো একের পর এক মুসলিম সেনা শহিদ হয়েছে এই লড়াইয়ে। তার ওপর আল্লাহর নবিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার চেষ্টারত মুসাইলামা ও তার স্ত্রী সাজাহ তখনো জীবিত। পাশাপাশি মুসলিম উম্মাহকে গোমরাহ করতে, শোষণ ও নির্যাতন করতে অপেক্ষারত মুসাইলামার সজ্জিত বাহিনী বাগানের ভেতর সুরক্ষিত অবস্থায় আছে, ময়দানে অবস্থানরত কোনো মুসলিমই শান্তি পাচ্ছেন না। কী করে তাদের নিধন করা যায়? তা নিয়ে আলাপ-আলোচনা ও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন মুসলিম সেনারা। সবার মাঝে দাউদাউ করে জ্বলছে প্রতিশোধের আগুন। বিশেষ করে বারা ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহুর অন্তর যেন জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। কিছুতেই তিনি খতমে নবুওয়াত অস্বীকারকারীদের নিরাপদে বসে থাকা সহ্য করতে পারছিলেন না। তাই তিনি পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, যেন তাঁকে বাগানের প্রাচীরের ওপর দিয়ে ছুড়ে ফেলা হয়। এতে তিনি প্রাচীরের ফটক খুলে দেওয়ার সুযোগ পাবেন। প্রাথমিকভাবে এই দাবি কেউই মেনে নেননি। কীভাবে নেবেন? বারা ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু একা একজন মানুষ, এতগুলো শত্রুর মাঝে গিয়ে কতটা নিরাপদই বা থাকবে, প্রাচীরের ওপর থেকে ছুড়ে ফেললে তিনি অক্ষতই বা থাকবেন কিনা? কেমন করে ফটকের দরজা খুলে দেবেন? তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাই কেউ তাঁর এই প্রস্তাবে সায় দেননি। কিন্তু বারা ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু নাছোড়বান্দা। কেবল নবিপ্রেম ছাড়া আর কী তাকে

উদ্বুদ্ধ করেছিল যে, তিনি হাজার হাজার অস্ত্রধারী সেনার মাঝে ছুটে গিয়ে বাগানের ফটক খুলে দিতে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন? তার দেহে প্রাণ থাকাবস্থায় আল্লাহর নবিকে হেয় প্রতিপন্নকারীরা নিরাপদ থাকবে; এটা তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না।

তাই বারবার তিনি মুসলিমদের বলতে লাগলেন—*প্রিয় ভাইগণ, আমাকে তোমরা উঁচু করে তুলে ধরো, প্রাচীরের উপর দিয়ে বাগানে ফেলে দাও। যাতে আমি বাগানের ফটক খুলে দিতে পারি, আর তোমরা ভেতরে যেতে পারো। হয় আজ আমি শহিদ হব। না হয় তোমাদের জন্য ফটক খুলে দিব!*

...

বারা ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু অন্যদের মতো স্বাস্থ্যবান ছিলেন না, বরং একেবারে জীর্ণশীর্ণ, রোগা ছিলেন। তাঁর শরীরের দিকে তাকালেই হাড় বুঝা যেত। তবে সাহসিকতায় তিনি ছিলেন দুর্নিবার, অনন্য। ফলে তিনি বারবার অনুরোধ করতে থাকলেন, যেন তাকে লৌহবর্ম পরিয়ে বাগানে ফেলে দেওয়া হয়। তাঁর লাগাতার পীড়াপীড়িতে মুসলিম সেনারা যেই না রাজি হলেন তাকে প্রাচীদের ওপর দিয়ে বাগানে পাঠাতে, তিনি তৎক্ষণাৎ একটি ঢালের ওপর চড়ে বসলেন। যেহেতু তিনি ছিলেন শীর্ণকায়, একেবারে হালকা-পাতলা, কাজেই তাঁকে তুলে প্রাচীরের ওপাশে নামিয়ে দেওয়া সেনাদের জন্য কঠিন কিছু ছিল না। বেশ কিছু নেজা যখন তাঁকে বাগানের মাঝে নিক্ষেপ করলেন, এক মুহূর্ত দম নিলেন না বারা ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বজ্রের মতো শত্রু সেনাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, ফটকের সামনে যুদ্ধ করে দশজনকে হত্যা করলেন। ততক্ষণে শত্রুরা তাঁকে তরবারির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলেছে। প্রায় আশিটির অধিক তির-তলোয়ারের আঘাতে রক্তাক্ত তাঁর দেহ। কিন্তু তিনি এতটুকু বিলম্ব করেননি, দম নেননি, বিশ্রাম নেননি। পূর্ণ উদ্যমে শত্রুদের আঘাত ফিরিয়ে দিয়ে দ্রুতবেগে বাগানের ফটক খুলে দিলেন। অবাক মুসলিম সেনারা। আল্লাহ বুঝি হক্কপন্থিদের এভাবেই সাহায্য করেন। যেখানে বারা ইবনে মালিকের জীবিত থাকারই কোনো রাস্তা ছিল না, সেখানে তিনি শত্রু সেনাদের সঙ্গে লড়াই করে বাগানের ফটক খুলে দিয়েছেন, এই ঘটনা নিজ চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা-ই যে বড় কঠিন।

ফটক খোলা পেয়ে স্রোতের মতো ঢুকলেন মুসলিম সেনারা। কচুকাটা করলেন খতমে নবুওয়াতের ব্যাপারে অবিশ্বাসীদের। প্রায় বিশ হাজার মুরতাদকে হত্যা করার পর মুসলিমরা নাগাল পেল মুসাইলামার। তাকে ধরাশায়ী করে মুসলিমরা বিজিত হলো। বারা ইবনে মালিককে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হলো। তাঁর শরীরের ক্ষত সারতে এক মাসেরও বেশি সময় লেগেছিল। কতই না সৌভাগ্য তাঁর! বারা ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাহসিকতা, তুমুল লড়াই ইয়ামামার যুদ্ধে মুসলিমদের বিজয়ের কারণ হিসেবে জ্বলজ্বল করবে সবসময়।

বারা ইবনে মালিক, আল্লাহর রাসুলের একান্ত খাদেম আনাস ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহুর ভাই। তিনি কখন ইসলাম গ্রহণ করেন এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। তবে তিনি কেবল বদর যুদ্ধ ছাড়া বাকি সকল যুদ্ধে আল্লাহর রাসুলের সঙ্গে অংশ নেন। শাহাদাতের নেশা সবসময় তাঁর চোখেমুখে ছিল। তিনি একেকটা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তেন বীর বিক্রমে। আর আল্লাহর শত্রুদের কচুকাটা করে বিজয় ছিনিয়ে আনতেন। এই মহান সাহাবির বীরত্ব সব কল্পনা, গল্প-উপন্যাসকে ছাড়িয়ে যায় ইয়ামামার যুদ্ধে। তবে তুসতার যুদ্ধে তাঁর ভূমিকা জানলে শিউরে উঠবে যে কেউ। শব্দের সমাপ্তি ঘটে যাবে, কলমের কালি ফুরিয়ে যাবে, কিন্তু তার বিজয়গাঁথা জ্বলজ্বল করবে সবসময়।

তুসতার যুদ্ধ

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকাল তখন। আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত বান্দারা ইরাক পার হয়ে, পারস্যের নানা রাজ্যে খেলাফত কায়েম করে নিয়েছেন। আবু মুসা আশআরি রাযিয়াল্লাহু আনহুর দায়িত্বে একটি দল এগিয়ে যাচ্ছে আহওয়াজ অঞ্চলের অভিমুখে। লক্ষ্য তাদের সন্ধি ভঙ্গকারী ইরানি নেতা হুরমুজান ও ইরান সম্রাট ইয়াজদিগারদকে প্রতিহত করে আল্লাহর আইন কায়েম করা। এই দলে অংশ নেন বারা ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু। আহওয়াজে পৌঁছানোর আগেই মুসলিম সেনাদের মুখোমুখি হয় হুরমুজান সেনাদল। তুমুল সংঘর্ষের এক পর্যায়ে কাপুরুষের মতো হুরমুজান পিছু হটে তুসতার কেল্লার ফটক লাগিয়ে দেয়। এই শহর আকাশচুম্বী প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল বলে হুরমুজান ও তার ইরানি সেনারা নিরাপদ বেষ্টনী পেয়ে

যায়। মুসলিম সেনারা প্রায় এক মাস এই কেল্লা অবরোধ করে রাখে। দুপক্ষ থেকেই পাথর ও তির বর্ষণ চলতে থাকে। পাশাপাশি ইরানি ফৌজ প্রায়ই এলোপাথাড়ি ঝটিকা আক্রমণের মাধ্যমে মুসলিমদের আঘাত করে পালিয়ে যায়। যেহেতু ইরানি সেনারা নিরাপদ বেষ্টনীতে ছিল, তাদের উল্লেখযোগ্য ক্ষয়ক্ষতি না হলেও শতাধিক শক্তসমর্থ, অভিজ্ঞ ইরানি যোদ্ধাকে কতল করে মুসলিম সেনারা। এক রাতে অপ্রস্তুত মুসলিম ফৌজের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ইরানি ফৌজ। লণ্ডভণ্ড করে দেয় মুসলিম ফৌজের কাঠামো। *অপ্রস্তুত এক মুসলিম সেনার মনে পড়লো আজ তাদের সঙ্গে এমন এক সাহাবি আছেন, যার ব্যাপারে খোদ আল্লাহর রাসুল বলেছেন, এমন কিছু ধূলিমলিন, উষ্কুখুষ্ক চুলের মানুষ আছে, যারা আল্লাহর নামে কসম খেলে আল্লাহ তাআলা তা পূর্ণ করে দেন। বারা ইবনে মালিক তাদের একজন। তিনি মুসলিম সেনাদের হাদিসটি মনে করে দিলে সবাই তাঁকে অনুরোধ করে বলেন—হে বারা, আজ আপনি আল্লাহর কসম করে বলুন, আল্লাহ দুশমনদের পরাজিত করবেন। বারা ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন আল্লাহর কাছে শাহাদাত ও বিজয় চেয়ে দুআ করেন। তিনি বলেন—হে আল্লাহ, আপনার নামে কসম করছি। আমাদের শত্রুর ওপর বিজয় দান করুন এবং আমাকে আপনার রাসুলের সঙ্গে মিলিত করুন।*

আল্লাহ তাআলা বারা ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহুর কসম পূর্ণ করলেন। শহরের এক অধিবাসী মুসলিম সেনাদের কেল্লায় প্রবেশের গোপন পথের সন্ধান দিল। সঙ্গে সঙ্গে বেশকিছু জানবাজ মুজাহিদ শহরে প্রবেশ করে কেল্লার ফটক খুলে দেন। স্রোতের মতো মুসলিম সেনারা শহরে প্রবেশ করেন ও মূল শহর নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। হুরমুজান প্রতিকূল পরিস্থিতি দেখে দ্রুত কেল্লার ভেতর প্রবেশ করে তির নিক্ষেপ করতে থাকে। এমন সময় বারা ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু কেল্লার ওপর আক্রমণ করেন। এবং হুরমুজানকে ধরাশায়ী করার চেষ্টা করেন। কিন্তু যে ব্যক্তি খানিক আগেই আল্লাহর কাছে শাহাদাত চেয়ে করেছে, আল্লাহ কীভাবে তাঁর দুআ কবুল না করে ফিরিয়ে দেন। হুরমুজান তীব্র আঘাতে বারা ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহুকে শহিদ করে ফেলে। কবুল হয়ে যায় তাঁর দুআ। এগিয়ে যান তিনি আল্লাহর রাসুলের সঙ্গে মিলিত হওয়ার বাসনায়।